স্মৃতিপটে বিদ্যালয়ের দিনগুলি

❑ অনন্ত ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র

সমাজ পাল্টে গেছে, সামাজিক মূল্যবোধ বদলে গেছে, বদলে গেছে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্ব্বস্ব পরিবার ভেঙ্গে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে আধুনিক যুগে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এক শিকড়হীন সংস্কৃতি, এক বহুরূপী জীবনচর্চা পৌঁছে দিয়েছে মানুষের ঘরে।

"বিদ্যার্থী ত্যজেৎ ভোগং ভোগার্থী জ্ঞান লালসাম,
ভোগার্থিনাং কুতো বিদ্যা ভোগং বিদ্যার্থিনাং কুতঃ ।" এই নীতিবোধ পুরনো হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত কোন এক নাগরিক শিশু যখন আজ ছবি আঁকতে বসে তখন তার কাগজে ফুটে উঠতে দেখি গ্রাম বাংলার সেই চিরাচরিত দৃশ্য যা সে দেখেনি কখনও। পরিশ্রম ক্লান্ত, যন্ত্রনাদগ্ধ আধুনিক মন হয়তো অজান্তেই খুঁজে বেড়ায় প্রাচীন জীবনবোধের পুরনো বটগাছটার শীতল ছায়া।

হ্যাঁ, সেই বটগাছটার মতনই ছিলেন আমার প্রথম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু তথা কামাখ্যা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা স্নেহলতা সেনগুপ্ত। ১৯৫৯ সাল। গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে সেন্ট্রাল গোটানগরের এক রেল কোয়ার্টারে আশালতা দাসগুপ্ত দিদিমনির তত্ত্বাবধানে পাঠদান শুরু হয়। পাঠদানের সীমাবদ্ধতা ছিল একই কক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। এর পরই কিছুদিনের জন্য আমরা স্থানান্তরিত হলাম বলাকা মাঠের কাছে পাহাড় ঘেড়া এক চালা ঘরে। তারপর সেন্ট্রাল গোটানগরের জুনিয়র রেলওয়ে ইনষ্টিট্যুটের সেক্রেটারী শ্রীযুত অনিল খাস্তগীর, শ্রীযুত সুশীল মজুমদার, শ্রীযুত সুধীর কুমার নাগ, শ্রীযুত ডি.এল. রায়, শ্রীযুত কামাখ্যা চৌধুরী, প্রমুখ শিক্ষানুরাগী মহোদয়বৃন্দের বদান্যতায় ইনষ্টিট্যুটের চৌহদ্দীতে আমরা এসে পাঠগ্রহনের সুযোগ পেলাম। সহপাঠী হিসেবে পেলাম নন্দিনী সরকার, সুরমা ভট্টাচার্য, রঞ্জিত কুমার নন্দী, আশিষ সেনগুপ্ত, তাপস আঢ্য । পরে পেলাম রাকেশ সরকার, বিনয় কুমার শর্মা, প্রবীর কুমার শর্মা, তুসার মজুমদার, শেলী চৌধুরী, নন্দিনী সরকার ও আরো অনেককে। পরে জেনেছি নন্দিনী সরকার বাংলার অধ্যাপিকা হয়ে কোলকাতায় চলে গেছেন। মান্নাদের সেই বিখ্যাত গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' র মত কেউ কেউ কোথায় চলে গেছে - মনে হয় স্মৃতি সততই সুখের।

বাবা আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়েছিলেন। ভীষন কান্না পেতো। স্নেহলতা দিদিমনি সত্যিই স্নেহের ভাণ্ডার ছিলেন। দিদিমনি মাথায় হাত বুলিয়ে আমার ভয় কাটাতেন। আজকে মনে হয়, তিনি হয়তো ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর এক দ্বিতীয় সংস্করণ। তিনি সুগায়িকাও ছিলেন। দ্রুপদী সংগীত, নজরুলগীতি ও রবীন্দ্র সংগীতে ছিলেন সমান পারদর্শীনি। গাইতেন ও শোনাতেন,

'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, ও রজনীগন্ধা সুধা ঢালো', - কখনও কিছু পুলি, পিঠে পায়েস নিজের হাতে তৈরী করে আমাদের খাওয়াতে ভুলতেন না। এরই মধ্যে আর এক মমতাময়ী দিদিমনি রাজুবালা নন্দী কে বেশ মনে পড়ে। তিনি আমার বাড়ীর কাছেই থাকতেন। তিনি পড়াতেন ধারাপাত, অংক ও ইংরেজী। স্নেহলতা দিদিমনি সমগ্র শ্রেণীকক্ষকে নিপুণভাবে পরিচালনা করতেন। পরে জানতে পারলাম স্নেহলতা দিদিমনি ১৯৪৮ সনে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। তিনি বাংলা পড়াতেন। বাংলা পাঠ্যবই 'মনিমালা' আমার এখনো বেশ মনে আছে। রবিঠাকুরের -

"দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে, চাঁদের লোভে লোভে"

কিম্বা

"আমাদের ছোট নদী চলে আকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে" পঙ্‌ক্তিগুলো স্নেহলতা দিদিমনি কী সুন্দর করে পাঠ করে শোনাতেন!

একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার পরিধি বাড়ল। বিদ্যালয় উঠে এলো সেন্ট্রাল গোটানগরের পাহাড় ঘেষা রেলওয়ে ইন্সপেক্টরস্ বিশ্রামাগারের পার্শ্ববর্ত্তী এক ছোট্ট চালাঘরে। কাঁচা মাটির ওপর কয়েকটি বেঞ্চে আমরা বসতাম। শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা বাড়ল। সেখানে পেলাম পরবর্ত্তী প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রকুমার মিত্র স্যারকে। উনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল এম. এ.। অংক, ইংরেজী এবং সংস্কৃতের উপর ছিল তাঁর অসাধারন ব্যুৎপত্তি। উনি ছিলেন ৫ ফুটেরও বেশী। বাঙালী কায়দায় ধূতি ও সাদা সূতির কাপড়ের ফুলশার্ট, গলার কাছের বোতাম ও দু হাতের কব্জির বোতাম আটকানো, পায়ে সাধারণ চটি জোড়া গলানো তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকট করে তুলতো। তিনি ছিলেন নম্র, খুবই শান্ত ও মৃদুভাষী, তাঁর নিঃশব্দ পদচারণা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে ভাব-গম্ভীর করে তুলতো। সাধারণ, অতি সাধারণ (অবশ্য বাহ্যিক) যে কতখানি অসাধারণ হওয়া যায়, কত মহৎ, বৃহৎ, গভীর, গম্ভীর হওয়া যায় রবীন্দ্র কুমার মিত্র স্যরকে না দেখলে জীবনে কোনও দিনই তা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারতাম না। রবীন্দ্র স্যরের অভূতপূর্ব নীতিশিক্ষা প্রদান মহামান্য বারট্রান্ড রাসেল-এর বিখ্যাত উক্তি কে মনে করিয়ে দেয় - "The goal of education is to give a sense of value of things other than domination to help creat wise citizens of a free community in which liberty and individual creativeness will flourish and working people will be masters of their fate, not tools of production....."। শারীরিক ভাবে রোগা ছিলাম বলে স্যর বাবাকে পরামর্শ দিতেন। ভয় পেলেও বুঝতাম যে তিনি আমাকে অন্তর থেকে স্নেহ করতেন। সেই সময় আমি বন্দিতা দিদিমনিকে পেয়েছিলাম। বাংলায় তাঁর কাছে আমি সব সময় বেশী নম্বর পেতাম। স্মৃতি দিদিমনি ও ছায়া দিদিমনিকে মনে পড়ে। মনে পড়ে আলো দিদিমনিকেও। অংক করাতেন শ্রী সাধন রঞ্জন সিন্‌হা স্যর। অংক করাবার সময় তাঁর

ভ্রুকুটি আমাদের মত কচিকাঁচাদের আতঙ্কিত করে তুলতো। যিনি পরবর্ত্তীতে রেলওয়ে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। রথীন্দ্র পুরকায়স্থ স্যর ও প্রদ্যোৎ স্যরকেও পেয়েছি। পরে জেনেছি রথীন্দ্র স্যর রেল থেকে অবসর নিয়েছেন ও প্রদ্যোৎ স্যর শিলং এর একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। আর পেয়েছি একজন সৎ, সরল কর্মনিষ্ঠ কর্মী দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়কে, তাঁকে এখনো চাকুরীরত অবস্থায় দেখে বেশ খুশি হয়েছি। আমার বোন মালতীও এই বিদ্যালয় থেকে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল। সে এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কর্মরতা। পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার সম্পর্কের জ্যেঠামশাই গণপতি ভট্টাচার্য স্যর আমাকে নেতাজী বিদ্যাপীঠে নিয়ে আসেন। সেই থেকে নেতাজী বিদ্যাপীঠ, পান্ডু কলেজ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (আইন বিভাগ)। মাদুরাই বিশ্ব বিদ্যালয় পরিক্রমা করে রেলের আইন বিভাগে কর্মরত আছি। হাজার ব্যস্ততার মাঝেও আমর প্রথম স্কুলের এই সুবর্ণ জয়ন্তী আমার মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করছে। আমি এই ঐতিহ্যমন্ডিত বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এই বিদ্যালয় আমার কাছে মন্দির তথা তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। যাঁদের অমূল্য শিক্ষাদান পদ্ধতি আমার জীবনে চলার পথকে কুসুমাস্তীর্ন ও ঋদ্ধ করেছে তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। আজ যাঁরা এখন শিক্ষক - শিক্ষিকার আঙিনাকে অলংকৃত করে আছেন, তাঁরা আমার চির নমস্য। উপনিষদের আপ্তবাক্য - 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত' - ওঠো, জাগো, জ্ঞানীর নিকট উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রবুদ্ধ হও - এই হোক আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের পাথেয়।

তমসো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

(লেখক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য আইন সহায়ক। বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 'রেজোনেন্স' এর জন্য মাইকেল মধুসুদন সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত)